উদ্বাস্তু উচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদে জ্যোতি বসুর বক্তব্য

[১৯৫৭ সালের ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভাষণ]

স্পিকার মহাশয়, এই বিল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমে আমি বলতে চাই যে, আমি জানি না কেন এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আইন যখন আলোচনা করবার জন্য আমাদের কাছে রাখা হয়েছে, তখন একবার আগে থেকে বসে একটা আলোচনার ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করা হয়নি। অথচ সরকার জানেন যে, এই বিল সম্বন্ধে কিরকম তীব্র প্রতিবাদ বাস্তুহারাদের মধ্য থেকে উঠেছিল এবং আমরাও এই বিল ১৯৫১ সালে যখন এখানে আসে, তাদের সঙ্গে একমত হয়ে ঐ প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলাম। সরকারের হয়তো মনে থাকতে পারে, সে সময়কার বহু পুরোনো প্রসিডিংস পড়লে মনে পড়বে যে, সে সময় দিনের পর দিন এই বিলের অলোচনা হয়েছে — এখানে এবং হাউস-এর বাইরে সেই প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছে, সাধারণ মানুষ ও বাস্তুহারাদের দ্বারা। এটা জানা সত্ত্বেও হঠাৎ একটি বিল আনা হলো। আমি অবশ্য কাল থেকে চেষ্টা করেছিলাম যাতে করে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে কিছু করা যায়। কাল কাউকে পাওয়া যায়নি, ধরা যায়নি। যাইহোক, আজকে আমরা অলোচনা করবার পর দেখলাম যে, অন্তত দু-একটা ব্যাপার সরকার জানতে পারেন। প্রথমে সেইগুলি সম্বন্ধে আমি বলি তারপর এই বিল সম্বন্ধে আমার মূল কথা বলব, যে সংশোধনী আমার আছে এই বিলে সে সম্বন্ধে বলব। আমরা আলোচনা করে দেখলাম যে একটি ধারা সেখানে পুলিসকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে জবরদখলি কলোনি বা এলাকা থেকে বাস্তুহারাদের ওঠাবার জন্য। এটা আসলে দেখা গেল রিডানডেন্ট। এমন নয় যে একটা খুব বড় জিত আমাদের হলো। কেন যে এটা সংযোজিত করা হয়েছিল সেটি আমি বুঝতে পারছি না

এবং আমার এতে মনে হয়েছিল এই ক্ষমতাটা তো এখনও আছে। এখনও যে অ্যাক্ট ইন অপারেশন, এই অ্যাক্টের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যাতে করে পুলিস ব্যবহার করতে পারেন—করবেন কি করবেন না, সে সরকার পক্ষ থেকে ঠিক করবেন। আমি স্বভাবতই বলব খুব প্রয়োজন পড়লেও করবেন না, কারণ, লাঠি মেরে এ সমস্যার সমাধান হয় না। এইসব বুঝে-শুনে আমাদের সাহায্য নিয়ে যদি আপনারা কাজ করেন বা বাস্তুহারাদের যে সংগঠন আছে, তাদের সাহায্য নেন, তাহলে হয়তো আপনারা কিছু জায়গা খালি করতে পারবেন, কিছু লোককে বসাতে পারবেন, কিছু লোককে ওঠাতে পারবেন, তাদের বিকল্প ব্যবস্থা হয়তো আপনারা করতে পারবেন। কিন্তু করবেন কি না করবেন সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার, আপনাদের উপর তা নির্ভর করছে। সেটা আপনারা ভেবে দেখবেন। কিন্তু আমি আবারও বলছি এটা রিডানডেন্ট—কোনো প্রয়োজন এর ছিল না। এ তো একটা গেলো—সরকার যা মেনেছেন এবং বলেছেন এটা তাঁরা রাখবেন না; এটা উঠে গেলো, ভালো হলো কিন্তু সকলে এতে দেখেছি সেখানে একটা ব্যাপক বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল, এটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি, কাজেই এটা উঠিয়ে নিয়ে ভালো করেছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেটা সুধীরবাবু বলেছেন—উনি আইন ব্যবসা করেন, ওঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়; আমরা যারা ডাঃ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় গিয়েছি, আমরা কেউ আইন ব্যবসা করি না, সুতরাং সুধীরবাবু যা বলেছেন, সেদিকে সরকার পক্ষ থেকে এবং জুডিসিয়াল মিনিস্টার-এর নজর দেওয়া উচিত। আমাদের সঙ্গে আলোচনার সময় একটা জিনিস ওঁরা মেনেছেন, কিন্তু সেটার ভাষায় যদি কারও মনে হয় অর্থ ঠিক হচ্ছে না, ঐ জায়গায় ঠিক করলেন না; যে জায়গায় করলেন সেখানে এলে কোনো মানে হচ্ছে না, অর্থাৎ পূর্বে যা ছিল তাই থেকে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এখনও সময় আছে, আজকেই আমাদের বিল শেষ হচ্ছে না। নিশ্চয়ই সরকার পক্ষ আমাদের ঠকাবার জন্য আমাদের সঙ্গে একমত হননি। মন্ত্রীমহাশয়কে তাই জিজ্ঞাসা করব আলোচনার সময় তিনি ছিলেন, আমিও ছিলাম—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, উনি সেটা যেন পরিষ্কার করে বলেন। আপনারা সংশোধনী এনেছেন—পুরানো যে আইন আছে তাতে চার নম্বর ধারায় যিনি একজনের জমি জবরদখল ক'রে বসেছেন, কোনো বাস্তুহারা তাকে যদি হঠাৎ ওঠাতে চান, তাকে কোথাও সুটেব্‌ল ল্যান্ড দিতে হবে। যে জমি থেকে তিনি যে ব্যবসা-বাণিজ্য আগে করতেন, সেগুলি ঠিকমত করতে পারেন।

যে জমি থেকে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য কবত, সেগুলি তারা সেইভাবে করতে পারবে। এ সোজা কথা এবং কম্পিটেন্ট অথরিটির উপর এই ভার ছিল, এই জমি দেওয়ার ভার। কম্পিটেন্ট অথরিটি সরকারের কাছে লিখতেন যে, এইরকম ক'জনকে

দিতে হবে। সরকার জায়গা যা দেবেন সেটার সম্বন্ধে বিচার হতো যে, এটা ঠিক জায়গা, কি বেঠিক জায়গা। তখন বিরোধীর মত স্বীকার করে আইন করেছিলেন, যখন মনে হয়েছিল যে অন্ততপক্ষে আকস্মিকভাবে যারা দলে দলে বাস্তুহারা হয়েছে, তাদের কোনো জবরদখল জায়গা থেকে উঠিয়ে দেওয়া সরকারের পক্ষে কঠিন; কারণ, ঐরকম জায়গা যদি সুটেব্‌ল হয়, তাতে পুনর্বসতি করুন আপত্তি নেই, আর সুটেব্‌ল ল্যান্ড না হলে আমরা বলেছিলাম যে, ওঠাতে পারবেন না। এবার যে নতুন সংশোধন করা হলো, তাতে বলা হলো যে, ল্যান্ড তোমাদের দিতে পারছি না, সেইজন্য ওঁরা বললেন "অর ল্যান্ড পারচেজ লোন", অর্থাৎ আমরা যদি জমি না দিতে পারি লোন দেব, এবং সেই লোন নিয়ে তোমরা ঠিক করবে, সেটা সরকার ঠিক করবেন না যে, কোথায় সে জমি, সেটা আর কম্পিটেন্ট অথরিটির হাতে নেই। সরকার লোন দেবেন আর বাস্তুহারাদের দায়িত্ব হলো সেটা দেখা। তার মানে হলো আমরা লোন দিচ্ছি তোমাকে ৫০০ টাকা, তুমি যেখানে খুশি যাও, তোমাকে জমি দিতে পারব না, তুমি যেখানে খুশি গিয়ে জমি কেন। এটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম। এটা যদি থাকত তবে স্বেচ্ছায় টাকা নিয়ে জমি ছেড়ে তাঁরা চলে যেতে চাইবেন, নিজেরা ব্যবস্থা করে নেবেন। শ্রীবিমল সিংহ মন্ত্রীমহাশয় যখন এই বিল আনেন তখন তিনি যে হিসাব দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন যে, ওঁর কাছে বাস্তুহারাদের অ্যাপ্লিকেশন আছে যে, টাকা দিলে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন। এইরকম থাকলে তাঁরা সরকারকে জমি ছেড়ে দিন, অন্য কোথাও গিয়ে টাকা নিয়ে জমি কিনুন, তাতে আমরা আপত্তি করব না। কিন্তু অন্য বাস্তুহারারা বলছে আমরা আসলে জমি কোথায় পাব? সরকার তো বলেছেন 'জমি নেই'; সেখানে আমাদের অসুবিধা হবে। সেইজন্য "অর" যদি দেওয়া থাকে জমিটা পাব না, আমাদের কতগুলি টাকা দিয়ে বলবেন 'তোমরা সরে পড়'। সেইজন্য আমাদের ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সেটা সংশোধন করবার জন্য আমরা সরকারকে বলেছিলাম এবং সুবোধবাবুরও সে সম্বন্ধে একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে; সেটাও নেওয়া হয়নি। রিফিউজিরা যদি স্বেচ্ছায় জমির বদলে ধার সরকার থেকে নেন, জমি কেনার জন্য, তাহলে তাঁরা নিতে পারেন। স্বেচ্ছায় যদি কেউ না নেন, জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না যে, এই টাকা তোমায় দেব, তুমি নিয়ে সরে পড়। এই ছিল উদ্দেশ্য। জোর করে কারও উপর টাকা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। যদি টাকা না দেন, তাকে ঐরকম উপযুক্ত জমি দেবার চেষ্টা করবেন। কম্পিটেন্ট অথরিটি আগে যেরকম ছিল তা করা প্রয়োজন। সরকার বলছেন যেরকমভাবে আইন হয়েছে, তাতে এটা হবে না। কম্পিটেন্ট অথরিটি কিছুই করতে পারবে না, সরকারই ঠিক করবেন কোন জায়গা কোন বাস্তুহারাকে দেবেন। এইটুকু বুঝেছি সরকারের সঙ্গে কথাবার্তায়। এটায় আমরা মত দিতে পারি না। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি যে, যদি কেউ লোন

না নেন তবে তাকে জোর করে লোন দেওয়া হবে না। এই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং সেই আলোচনায় সুধীরবাবু ছিলেন না। কিন্তু সেটা যে কার্যকরী হচ্ছে না, আসলে ফাঁক একটু আছে এটা নিশ্চয় বলব, আর সেটার কারণ সরকার পক্ষই বলবেন। আমাদের মোটামুটি এই এগ্রিমেন্ট হয়েছে। তা ছাড়া একটা 'এভার' কথা ছিল, সেটা বড় কথা নয়; সরকার সেটা মেনে নিয়েছেন। আমি আজ তার ভিতর যাচ্ছি না। এখন আমার মূল কয়েকটা কথা বলব। যেকমভাবে আইন এল এবং যেরকমভাবে আলোচনা হলো তাতে হঠাৎ আমরা দেখলাম যে, দুই-একটা এ্যামেন্ডমেন্ট সরকার পক্ষ গ্রহণ করেছেন, আর দুই-একটা মানলেন আংশিকভাবে, পুরা মানলেন না। তাতে মনে হবে যে, আমরা বিরোধী দল এবং সরকার পক্ষ একমত হয়ে একটা আইন এনেছি। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। যদি এরকম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কারও মনে থাকে, তবে তা দূর করে দেওয়া ভালো। কারণ বুঝতে হবে যে, এ আইন আমরা চাইনি। এ-কথা ঠিক নয় যে, এ আইন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে আনা হয়েছে। ১৯৫১ সালেও চাই নি, আজও চাই না। আমরা চেয়েছিলাম অন্যভাবে বাস্তুহারা সমস্যার সমাধান। আমরা চেয়েছিলাম যে, জবরদখল কলোনি, যারা জমি দখল করে রয়েছে, তারা জবরদখল বলে নয়, সেটা অন্যভাবে মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ সমস্যার সমাধান করে সেটা দখল করতে। ওদের সঙ্গে যদি অন্যভাবে মিটমাট হতো সেটা ভালো হতো। কিন্তু সরকার জোর করে একটা আইন এনেছে, এবং সে আইন কার্যকরী করতে গিয়ে অনেক রকম অসুবিধা হচ্ছে। সেইজন্য আমরা যখন জানি যে, সরকার যে এটা পাশ করে দেবেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কেন না, ওঁদের মেজরিটি আছে—সেইজন্য আমরা দেখছি যে কতটা এর হাত থেকে বাস্তুহারাদের বাঁচানো যায়, এবং মন্দের ভালো কতটা করা যায়—বিশেষত যেসব ধারা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের একমত হওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি সম্বন্ধে। আর দুই-একটা ধারায়ও আমরা একমত নই। এই কম্পেনসেশন আদায়ের ব্যাপারটা "পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারীর" মধ্যে আনায় আমরা একমত হতে পারি না। কারণ, টাকাটা তারা কি করে দেবে? 'পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারী' আইনে তাদের কাছ থেকে জোর করে নিতে পারেন কিন্তু টাকা তাদের নেই, তারা দিতে পারবে না। তারা সেই কম্পেনসেশন-এর টাকা যদি না দিতে পারে এবং তাদের যদি অর্পণ-পত্র দিয়ে থাকেন, আর তাদের মেনে নিয়ে থাকেন, তাহলে আবার তারা বিতাড়িত হতে পারবে না। সে বিপদও আছে। এই বিপদের কথা সরকার চিন্তা করছেন না। এই দুটো বিপদের কথা বলে তারপর বলব যে, ১৯৫১ সালে যে লেখালেখি হয়, সেগুলো খুলে দেখলে দেখবেন যে, আমরা বারে বারে বলেছি যে, এদের মধ্যে ডিফারেনসিয়েশন করতে হবে, যারা জবরদখল করে অর্থাৎ অন্য লোকের জমিতে বাস্তুহারারা আছে, সেখানে সেই লোককে জমি ফেরত দিতে হবে। আমরা সেখানে বলেছি যে, এখানে

কিছু ডিফারেনসিয়েট করতে হবে। যাদের নিজের প্রয়োজনে খুব বেশি জমির দরকার নেই, আর যারা অল্প-বিত্তশালী, সাধারণ মানুষ, যাদের জমিতে বাস্তুহারারা বসেছে, তারা মুসলমান হতে পারে, অমুসলমানও হতে পারে, হিন্দু হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, তাদেরই জমি ফিরিয়ে দেবার কথা হচ্ছে প্রথম কথা। তাদের কম্পেনসেশন দেবার কথা সর্বপ্রথম কথা; কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার সেভাবে সমস্যাটা দেখছেন না। ওঁদের কাছে লক্ষপতি জমিদার, বড় বড় মাড়োয়ারী, যারা জঙ্গলের মধ্যে জমি কিনে রেখেছিল, আর যারা কৃষক, যার দশ বিঘা, পাঁচ বিঘা জমি ছিল এবং তার উপর বাস্তুহারা এসে বসেছে এক কথায় ওরাও যে তাই, অর্থাৎ বাস্তুহারার মতো। আমরা তাই বলছিলাম এরকম করবেন না; আসুন আমরা এক সঙ্গে বসি এবং আপনারা একটা লিস্ট তৈরি করবেন। আমাদের লিস্ট তৈরি করবার মতো সরকার তখন কোনো ফিগার দিতে পারেননি। কতজন মুসলমানের জমিতে বসেছে, কতজন গরিব পশ্চিমবাংলার অধিবাসীর জমিতে বসেছে, কতজন বড় লোকের জমিতে বসেছে, এরকম কোনো সংখ্যা আমাদের দিতে পারেননি। তাঁরা বললেন এইসব সংখ্যা আমাদের নেই, এসব পরে বিবেচনা করে দেখব। ১৯৫১ সালের আলোচনায় এইসব হয়েছিল। আমরা তখনও বলেছিলাম, এখনও বলছি যে, জোর করে কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন না, সেইজন্য যদি একসঙ্গে পরামর্শ করতেন, যদি সেরকম লিস্ট তৈরি করতেন যে ছাড়তে হবে, এমন আটশো জায়গা আছে বা তার কম্পেনসেশন দিতে হবে, সেগুলি নিয়ে দু'পক্ষ বা তিন পক্ষকে ডেকে আমরা যদি আলোচনা করতাম, তাহলে ভালো হতো। এমন হতে পারে কতকগুলি জায়গায় জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, কতকগুলিতে কম্পেনসেশন দিতে হবে, আবার এমনও হতে পারে, বাস্তুহারার আশেপাশে জমি আছে, সেখানে কিছু ফেরত দিতে হবে না, যাদের জমি তারা খুশি হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে, বিশেষ করে মুসলমান অনেক আছে, টালিগঞ্জে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা দেশে ফিরে যাবে, আজকে যদি বাস্তুহারা কলোনি করে দেওয়া হয়।

বিশেষ করে টালিগঞ্জের মুসলমানদের সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু তারা কোথায় ফিরে যাবে? যদি আপনি এই আইনের মারফত বাস্তুহারা কলোনিগুলোকে ডিস্‌ব্যান্ড করে দেন এবং বলে দেন যে, এই জবরদখল কলোনিগুলো ফেরত দিতে হবে তাহলে সেই মুসলমান ভাইরা কি সেখানে ফেরত যাবেন? আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে তারা ফেরত যেতে পারবে না। সেখানে বিরাট বিরাট কলোনি গড়ে উঠেছে। আমার কাছে এইরকম একজন কৃষক সম্প্রদায়ের লোক এসেছিলেন। তাঁর নাম মুন্সী জামসেদ আলি। তাঁর পরিবারে ১০ জন লোক আছে। এঁর ২২ বিঘা জমি আছে এবং এটা যেখানে বাঘা যতীন কলোনি, বাপুজী কলোনি ইত্যাদি আছে, সেখানে তাঁর জমি ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে,

আপনি কি চান যে সেই কলোনিগুলো ভেঙে আপনার ধানী জমি আপনাকে ফেরত দেওয়া হোক? তিনি উত্তরে বললেন যে, তিনি এটা মোটেই চান না। কারণ, উনি জানেন যে, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব অন্য জায়গায় স্ক্যাটার হয়ে গেছে বলে সেখানে আর থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ওঁকে যদি কিছু দাম ধরে দেওয়া হতো, কিছু কম্পেনসেশন দেওয়া হতো, তাহলে ওঁর কোনো পথের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারলেই উনি খুশি হতেন। এই রকম ভাবে বিভিন্ন জায়গায় এই অবস্থা আছে। আবার কতকগুলো জায়গায় এই নিয়ে আমরা, যেমন বরাহনগরে জয়েন্ট কমিটিও করেছি। বাস্তুহারারা, যারা মুসলমানদের ঘর দখল করেছে, সেই ব্যাপার নিয়ে আমরা কবে থেকে সরকারকে বলছি যে, এই পাশের জমিগুলো যদি আপনারা এ্যাকোয়ার করে বাস্তুহারাদের সেখানে বসাতে পারেন তাহলে দু'মাসের মধ্যে ঐ বাড়িগুলো আপনারা ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু পাঁচ বছর হয়ে গেল আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি। এই সমস্ত ঘটনা আমি শুধু উদাহরণ হিসাবেই আপনাকে দিচ্ছি। কাজেই এখানে মুসলমান ও বিধবা এই কথা বলে কোনো আইন করা যায় না। বিধানবাবু হয়তো তিনটি বিষয়ে দেখেন যে কেন তিনি এই আইন আনছেন—বিধবা, রিটায়ার্ড এবং মুসলমান। আমি বলছি এই লিস্ট অনুযায়ী আইন করলে কোনো কিছুই হবে না, অর্থাৎ আপনারা এইরকম করলে কার্যকরী কোনো সুব্যবস্থাই করতে পারবেন না। দশ-কুড়িজন খারাপ লোক, যারা কথা শুনবে না তাদের জন্য আইন আপনারা প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় সবাই মিলে চেষ্টা করলে এইসবের প্রয়োজন হবে না, কারণ এইরকম অনেক উদাহরণ আমাদের জানা আছে। আপনাদের আইন যে ব্যর্থ হয়েছে সেটা আপনারা নিজেরাই দেখছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন যে তিন বছরের জন্য সময় নিচ্ছি। তারপর আর একজন মন্ত্রী তিন বছরের পর বললেন আড়াই বছর সময় দিলে সেই আড়াই বছরের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় কিছুই তো করতে পারলেন না? আবার আজকে শ্রীবিমল সিংহ বলছেন যে, এক বছর সময় দিলে দেখি কি করতে পারা যায়। আপনারা কিছুই করতে পারছেন না, কারণ আপনাদের সেই পদ্ধতিই নেই। আপনারা এমনভাবে অর্ডার দেন যাতে করে পূর্ব-বাংলা পশ্চিম-বাংলার মানুষের মধ্যে একটা বিবাদ লেগে যায়। আপনারা এইসব বিষয়ে কারুর কো-অপারেশন নেবেন না। আপনারা সব সময় মনে করেন যে, রাইটার্স বিল্ডিং আর অর্ডার দিয়ে সব করবেন এবং যদি ওঁদের সাহায্য নিতে যাওয়া হয় তাহলে ওঁদের নাম হয়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে। আমি বলছি যে, সাড়ে চার বছর পর এটা আপনারা ভাবতে আরম্ভ করবেন। ইলেকশনের ছয় মাস যখন বাকি থাকবে, তখন আর আমাদের সঙ্গে কথাই বলবেন না এবং খালি রিলিফই দিয়ে যাবেন। এ ছাড়া

ফ্লাড বলে আপনাদের বেশ সুবিধাও হয়ে যাবে। কিন্তু আমি বলছি যে, এই দেড় বছর তো একসঙ্গে হয়ে যে কতকগুলো কাজ করা যায় সেগুলো আমরা করবার চেষ্টা করি। এখানে যদি আপনারা দেখেন যে আমরা সেখানে রাজনীতি করছি বা আমরা যদি দেখি এইসব নিয়ে আপনারা রাজনীতি করছেন এবং কারুর সমস্যা সমাধানের কোনো মতিগতি নেই সেখানে আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু আপনারা এইরকম কোনো উপদেষ্টা কমিটিই করলেন না। সেজন্য আজ এইরকম দুর্দশার মধ্যে বাস্তুহারাদের এনে ফেলেছেন এবং আপনারাও পড়েছেন। যাহোক এই ব্যাপারে আমি আর খুব বেশি সময় নেব না। কিন্তু অনেকেই আমাদের মধ্যে বলছেন যে আপনারা যখন একটা সংশোধন আনলেন তখন রিফিউজির ডেফিনেশনটা বদলালেন না কেন? এটা অবশ্য আপনাদের নীতি নয় বলে আপনারা বলবেন যে, আমরা বদলাব না এবং দণ্ডকারণ্যে যখন পাঠাব তখন আর এখানে এইসব বদলে কি লাভ আছে। কিন্তু আসলে তো সেটাও হবে না। সেজন্য আমি বলি যে, আমাকে বাস্তুহারা বন্ধুরা বলেছিলেন যে, বোধ হয় ১০০টা বাস্তুহারা কলোনি আছে, যেগুলোকে আপনারা রিকগনাইজ করতে পারেন। কথাটা সত্য কি না সে বিষয়ে আপনাদের তো খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। অর্থাৎ সেগুলো অনাবাদি জমি কিনা, পড়ে ছিল কিনা সেটা তো খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। আইন করেছি বলে সংশোধন কখনও করব না এমন তো আপনাদের কথা নয়। কারণ বারে-বারে সংশোধন করবার জন্য, মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য যখন আইন আনছেন, তখন এই ১০০টা কলোনি, যাদের আপনি রিকগনাইজ করবেন বলেছেন সেগুলো তো আপনি করতে পারতেন। এজন্য আপনাদের রিফিউজিদের জন্য ডেফিনেশন বদলাতে হবে। কিন্তু আপনারা সে সব কিছুই করলেন না। অর্থাৎ ১৯৫০ সালের পর যারা এসেছে এবং তারা যদি কলোনি জবরদখল করে গড়ে থাকে, তাহলে সে সব কিছুই আপনারা যে মানবেন না সেটা আপনারা ঠিক করছেন। এই ব্যাপারে আমি বলব যে, বিশেষ করে ছোট ছোট জমির যারা মালিক, যাদের নিজের কাজের জন্য জমির প্রয়োজন বা যারা সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে জমি কিনেছিল, যাদের জমিতে বাস্তুহারারা বসেছে, সেই সমস্ত কেসে আমরা অত্যন্ত ইন্টারেস্টেড। এগুলো আপনাদের দেখা দরকার। অর্থাৎ যাতে করে তারা সেগুলো ফেরত পায় বা এমন কম্পেনসেশন পায় যাতে করে তারা অন্য কোথাও কোনো ব্যবস্থা করে নিতে পারে। কিন্তু ঐ লয়েলকা বা শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার জমি ফেরত পাবে কি না সে বিষয়ে খুব বেশি ইন্টারেস্টেড নয়। কারণ আমরা জানি যে, তাঁরা শুধু ব্যবসার খাতিরে জমি ফেরত চাচ্ছেন। আপনারা দেখুন যে, এজন্য কত বড় অন্যায় হচ্ছে। এবিষয়ে আমি শ্রীমতী রেণুকা রায়কে বহুবার বলেছি, কিন্তু কোনো সহযোগিতা পাইনি।

শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দারের জমি আপনারা ছেড়ে দেবেন এবং বোধ হয় ৫০-৬০ বিঘা জমি আপনারা ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু সেখান থেকে রিফিউজিদের এখনও পর্যন্ত ওঠাতে পারেননি বলে তাদের জন্য টেনিমেন্ট করছেন। এবং বলছেন যে, তাদের লাঠি মেরে উঠিয়ে দিয়ে টেনিমেন্ট-এ পাঠিয়ে দেবেন এবং জমিগুলোকে খালি করে তাকে দেবেন। কিন্তু কিসের জন্য? উনি কি বাড়ি করে সেখানে থাকবেন? না উনি ওখানে চাষবাস করবেন? বরং অনেক দামে সেই জমি তিনি বিক্রি করবেন। অর্থাৎ ওখানে "জয়" কারখানা ইত্যাদি যা আছে তাদের কাছে বিক্রি করবেন। আমি নিজের কথাই একটু বলি। আমার দিদি, তার মেয়ের জন্য একটা জমি রেখেছিল যেখানে, সেখানে বাস্তুহারা বসেছে। সেখানে ৫-৬টা ফ্যামিলি বসেছে। আমার দিদি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের তো অনেক আইন-কানুন হয়, তাতে ঐখানে যেখানে পোদ্দারের জমি ছেড়ে দেওয়া হলো, সেখানে আমার জমিটা কেন ছাড়া হলো না? শ্রীমতী রেণুকা রায় আমাকে বলেছিলেন যে, এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের সরকারকে দিয়ে এটা উনি ছাড়িয়ে এনেছেন বলে আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এর উত্তরে আমি বললাম যে, এটা কি উনি বুঝবেন? কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তো সব জায়গায় আছে কিন্তু এটা কি হলো? আমরা জানি যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে এইরকম বড় বড় লোকেরা অনেকেই তারা এই নিয়ে এসেছে যে, ওদের জমিগুলো খালি করে দেওয়া হোক যাতে ওরা ঐগুলো বিক্রি করতে পারে। আমি বলছি যে, আমার দিদির মতন জমিতে যদি বাস্তুহারা পরিবার বসে থাকে এবং আশেপাশে যদি কোনো জায়গা না থাকে তাহলে তা আপনারা দেবেন না। কারণ, আমি জানি যে, সেই জমি না পেলে সে না খেয়ে মরবে না বা তার মেয়েও না খেয়ে মরবে না। সেজন্য সেই জমি আপনি বাস্তুহারাকে দিয়ে দিন এবং তারা সেখানে যখন একবার দখল করে বসেছে, তখন তারা সেখানে বসুক। কিন্তু তাকে টাকা দিন যাতে সে অন্য ব্যবস্থা করতে পারে। এইরকমভাবে গরিব লোকের জমির উপরে যখন তারা বসেছে তখন ঐ গরিব লোকের একটা ব্যবস্থা আপনারা করে দিন, না হয় টাকা দিন যাতে করে তারা অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করে নিতে পারে। আপনারা কার্যক্ষেত্রে নানারকম কথা বলেন কিন্তু আসলে আপনারা ঐ বড় লোকের দিকেই খালি তাকান। অর্থাৎ ঐ জমিগুলোকে কি করে খালি করা যায় এবং বাস্তুহারাদের সেখান থেকে লাথি মেরে তোলা যায়, সেদিকেই নজর আছে। কাজেই আপনাদের কাছে মানুষের চেয়ে বড় লোকের সম্পত্তির কদরটাই হচ্ছে সব চেয়ে বেশি। আপনাদের এই যে বিল, যেটা আজকে এনেছেন এবং যে আইন আপনাদের আছে তার মধ্যে এটাই আমি অন্তত দেখতে পাই। মানুষের জীবনের চেয়ে, বাস্তুহারাদের চেয়ে কিছু বড় লোককে কি করে টাকা দেওয়া যাবে, তাদের

জমি কি করে ছেড়ে দেওয়া যাবে, এটাই আপনাদের কাছে বড় কথা। কারণ তা না হলে যে জঙ্গল জমি পড়েছিল সেগুলোকে বাস্তুহারারা উদ্ধার করে যখন বসেছিল তখন আপনারা বাস্তুহারাদের দিকে ফিরেও একবার তাকাননি। যখন শেয়ালদা স্টেশনে কুকুর-বেড়ালের মতন তাদের ছেলেপেলেরা মরেছে, তখন তাদের দিকে আপনারা তাকাননি বলে তারা আইন ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছে এবং সেই কারণেই তারা কলকাতার আশেপাশে জমি দখল করে বসেছে। এজন্য আপনারা কি বলবেন যে তারা অন্যায় করেছে? আপনারা তা বলতে পারবেন না। আইনের চোখে তারা অন্যায় করতে পারে, কিন্তু মানবতার কাছে তারা তো অন্যায় করেনি। মানুষ মরে যাবে তবু তারা জঙ্গল জমিতে গিয়ে, অন্য লোকের জমিতে বসবে না, কেউ একথা বলবে না। সেজন্য আমি আপনাদের বলব যে, আজও আপনাদের চিন্তা করবার সময় আছে। আপনারা এক বছর সময় নেবেন বলে এই আইনও আপনারা পাশ করাবেন কিন্তু আমি জানি যে, এক-দুই-তিন বছরেও আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, যদি না আপনারা আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলান। আপনারা যদি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে প্রত্যেকের সহযোগিতা নেন এবং আমাদের প্রভাব বেড়ে গেল বলে চার বছর যদি ভয়টা না করেন তাহলে সব সমস্যা সহজ হয়ে যাবে। মানুষের যদি ভালো হয়, মানুষই আপনাদের আশীর্বাদ করবে। এই সমস্ত করে দেখুন যে, সমস্যার সমাধান করা যায় কি না। ২-৪টা কেস হয় তো করা যাবে না—সেগুলো কিভাবে করা যায় সে-সব আমরা দেখব।

কাজেই মুসলমানদের কথা বলব। আমি আপনার কাছে বলতে পারি—আপনি লাঠি মেরে লোক উঠিয়ে দিয়ে মুসলমানদের বলবেন, তোমাদের জমি খালি করে দিলাম, তোমরা ওখানে গিয়ে বসবাস কর। কিন্তু যারা গরিব মুসলমান, তারা কখনই ঐ জায়গায় বসবাস করতে চাইবেন না। বারে-বারে তারা সমস্ত কিছু হারিয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা বলছে মিলমিশ করে, একটা আলোচনা করে, একটা জিনিস করি। তারা এ-কথা বলেছে এবং অল্টারনেটিভ্, বিকল্প ব্যবস্থা দেখিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তাঁরা যাচ্ছেন না। খালি অর্ডার আসে, ফাইল চাপা পড়ে থাকে, লালফিতে দিয়ে বাঁধা থাকে, এইসব জিনিস হচ্ছে। সেইজন্য আইন করুন, আর যা কিছু করুন না কেন, কিছুই হবে না। আমি তাই মন্ত্রীমহাশয়কে বলছি, একটা স্টেটমেন্ট করুন, কম্পেনসেশনের ব্যাপারে। এই কম্পেনসেশনের ব্যাপারে বাস্তুহারারা এত ভয় পাচ্ছে কেন? পাঁচ, সাত বছরের কম্পেনসেশন দেবার ব্যবস্থা সরকার করে দেবেন। বাস্তুহারাদের লোন দেবেন, যাতে করে তারা, তাদের জমির মালিককে কম্পেনসেশন দিতে পারে; অথচ এটা আইনে থাকবে না। তাহলে একটা স্টেটমেন্টই থাক; সেই ভালো। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বা আইনমন্ত্রী, যিনি বিল এনেছেন, তিনি যদি এই ফ্লোর অফ দি হাউস-এ দাঁড়িয়ে একটা

স্টেটমেন্ট করেন তাহলে কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারি; কারণ ভারত-সরকারের সঙ্গে কথা চলছে। কাজেই আমি এই কথাটা বলে রাখলাম, কারণ, এখনও সেই রকম কোনো স্টেটমেন্ট আসেনি। এই কয়েকটি কথা বলার পরে, আমার শেষ কথা, শেষ আবেদন আপনার কাছে—এই আইন অত্যন্ত খারাপ, সামগ্রিকভাবে আমি এই আইনের বিরোধী, এই আইন কার্যকরী হয়নি, এই আইন কখনও কার্যকরী হবে না। কিন্তু আইন যখন পাশ করবেন, তখন বসে থাকবেন না অ্যাসেমব্লি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সবাইকে ডাকুন, লিস্ট সব তৈরি করুন, দেখুন কিভাবে, কোথায় কি ব্যবস্থা করা যায়। এই হচ্ছে আপনার কাছে আমার শেষ আবেদন। তা যদি না করেন, তাহলে, আপনাকে বারে-বারে আসতে হবে, মার্চ মাসে আবার এসে বলতে হবে, আর আমাদের দু-বছর সময় বাড়িয়ে দিন, এবার আমরা লাঠি মেরে লোককে তাড়াবো। আমি বলি, লাঠি মেরে তো অনেক কিছু করলেন; আর করবেন না অনেক মেরেছেন, এবার আসুন শান্তিপূর্ণভাবে কোনো ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য করা যায় কিনা দেখুন। এক বছর, দু-বছরের জন্য অন্তত একটা টেস্ট করে দেখুন যে সেটা কার্যকরী হয় কি না? আমার অনুরোধ এই আইন আপনি বাস্তুহারাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সর্বনাশ করবেন না। এই আইন বাস্তুহারারা মানবে না, আমরাও মানব না। আমাদের আবার হয় তো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তাতে আবার আপনাকে একটা রোড মিছিলের সম্মুখীন হতে হবে। এতে আপনার লাভ নেই, বাস্তুহারাদের লাভ নেই, আমাদের কারও লাভ নেই। এইজন্য আমি আমার এই আবেদনের পরে, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[১৯৫৭-র ১০ জুলাই, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভা গঠনের মাস চারেকের মধ্যে বিধান রায় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ (১৯৫৭-৬১) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও অননুমোদিত জমি দখলকারী উচ্ছেদ সংশোধনী বিল, ১৯৫৭' বিধানসভায় পেশ করেন। ঐ দিনই বিধান পরিষদে পাশ করানো হয়। বাস্তুহারা মানুষের স্বার্থ বিরোধী এই বিল তীব্র বিরোধিতা করে ১০ জুলাই (১৯৫৭) জ্যোতি বসু ভাষণ দিয়েছিলেন। বসু তখন বিরোধী দল নেতা। বসুর আগে ভাষণ দেন সমর মুখার্জি। 'যতদূর মনে পড়ে' গ্রন্থে বসু লিখেছেন 'আমাদের সমালোচনার চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত বিলটিতে জবরদখল উচ্ছেদের ধারাটি উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। উদ্বাস্তু আন্দোলন আংশিক সাফল্য পায়। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ ও অন্য দুটি সংগঠনের উদ্যোগে এই উপলক্ষে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে এক বিরাট মিছিল বিধানসভা অভিযান করে ১০ই জুলাই। মিছিলটি বিধানসভা পৌঁছলে আমরা অর্থাৎ বিরোধী নেতৃবৃন্দেরা বিধানসভা থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানাই। উদ্বাস্তু আন্দোলন পরবর্তী দিনগুলিতে আরো বিস্তার লাভ করে।' (এন. বি. এ. কলকাতা পেপারব্যাক, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৩৫)।]